বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩২/ডিসেম্বর ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43ii.008

জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা উপন্যাসে ক্ষমতা-সম্পর্কের স্বরূপ

মো. গোলাম মাহ্‌মুদ পাভেল*

সারসংক্ষেপ

শহীদুল জহিরের *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* উপন্যাসে পুরনো ঢাকার একটি মহল্লার যে সমাজ-কাঠামোর সাক্ষাৎ মেলে তার ক্ষমতা-কাঠামোর কেন্দ্রে অবস্থান করছে রাজাকার বদরুদ্দিন মওলানা; আর প্রান্তে আছে মহল্লাবাসী জনতা। তবে বদরুদ্দিনের সাথে মহল্লাবাসীর এই ক্ষমতার সম্পর্ক পূর্বাপর অপরিবর্তিত থাকেনি। মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব, যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন উক্ত মহল্লার সামাজিক ক্ষমতা-সম্পর্কে গুণগত পরিবর্তন সাধন করেছে। বর্তমান প্রবন্ধে সময়ের এই তিন পর্বে উপন্যাসটিতে বর্ণিত সমাজের সামাজিক ক্ষমতা-সম্পর্কসমূহ বিশ্লেষিত হয়েছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী আলোকপ্রক্ষেপে এবং সেই সূত্রে মহল্লাটির ক্ষমতাকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত বদরুদ্দিনের ক্ষমতা অর্জন ও প্রয়োগের কৃৎকৌশল অনুসন্ধান করে মহল্লাবাসীর উপর চর্চিত তার ক্ষমতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত মার্কসবাদী সমাজতাত্ত্বিকগণের, প্রধানত আন্তনিও গ্রামসির, তত্ত্বের ভিত্তিতে ক্ষমতা-সম্পর্কের দুই রূপ 'প্রভুত্ব' ও 'আধিপত্য' বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে প্রবন্ধের শুরুতে। এছাড়া উপন্যাসটিতে অর্থনৈতিক শ্রেণি-সম্পর্কের অনুপস্থিতির কারণে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী প্রেক্ষণে টেক্সটটি পাঠের সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

চাবি-শব্দ: শহীদুল জহির, *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা*, ক্ষমতা-সম্পর্ক, উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ, প্রভুত্ব, আধিপত্য।

প্রস্তাবনা

কথাকোবিদ শহীদুল জহির (১৯৫৩-২০০৮) বাংলাদেশ ও বাঙালির জাতীয় জীবনের প্রায় দেড় যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে পুরনো ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী লেনের একটি মহল্লার অধিবাসীদের মুক্তিযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী পনের বছরের জীবন-বাস্তবতার প্রতীকাভাসে বয়ন করেছেন তাঁর প্রথম উপন্যাস *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা*'য় (১৯৮৭)। অর্থাৎ, তাঁর অপরাপর কথাসাহিত্যের মতো, এ-উপন্যাসে বর্ণিত মহল্লাটিও হয়ে উঠেছে সমগ্র বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি এবং মহল্লাবাসী প্রতিটি চরিত্র হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক শ্রেণির প্রতিভূ। কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক লিখেছেন :

> এই মহল্লাটি শহীদুল জহিরের এক টুকরো বহির্বাস্তব। সেই বাস্তবই তাঁর উপন্যাসের অবলম্বন। ঐটুকু সীমানা-বাঁধা, সময়-বাঁধা, ঘটনা-বাঁধা বাস্তব অক্ষরশব্দবাক্যঠাসাই হয়ে মাত্র বাহান্ন পৃষ্ঠার মধ্যেই রূপান্তরিত হয়ে যায় সারা বাংলাদেশে। পুবে থেকে পশ্চিমে ছড়ানো, উত্তর থেকে দক্ষিণে সমুদ্রশায়ী বাংলাদেশে। তার বিস্তৃত রণাঙ্গনে। ঐ মহল্লার বিশ ত্রিশ হাজার মানুষ একাত্তরের সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে।[১]

সুতরাং, উক্ত মহল্লার ক্ষমতা-কাঠামোকে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী পনের বছর সময়ে সমগ্র বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা-কাঠামোর একটি পাঠ রচনা করা

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্ভব। এই পাঠ উক্ত সময়ে-পর্বে বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক শ্রেণিসমূহের পারস্পরিক ক্ষমতা-সম্পর্কের স্বরূপকে উন্মোচিত করবে এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা-সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা দেবে। বর্তমান প্রবন্ধটি উক্ত বিশ্লেষণকর্মের একটি প্রয়াস।

সাহিত্য-সমীক্ষা

প্রথম প্রকাশের পর দীর্ঘকাল শহীদুল জহিরের *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* উপন্যাসটি পাঠক-সমালোচকের যথাযোগ্য মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি। অথবা, বলা ভালো, বাংলা সাহিত্যের পাঠক-সমালোচকদের এ-উপন্যাসের জন্য সহৃদয়হৃদয়সংবেদী হয়ে উঠতে অনেকটা সময় লেগেছে। তাই উপন্যাসটি প্রকাশের প্রায় দেড় দশক পর সমালোচক আহমাদ মাযহার তাঁর *আধুনিকতা: পক্ষ, বিপক্ষ* (২০০১) গ্রন্থে এ-উপন্যাস নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন আক্ষেপের সুরে :

> কয়েক বছর আগে প্রকাশিত হলেও *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* সম্পর্কে কোনও উল্লেখযোগ্য আলোচনা কোনও পত্রিকায় এমনকী কোনও লিটল ম্যাগাজিনেও চোখে পড়ে নি। লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকদের পক্ষে অর্থাৎ যাঁরা সাহিত্যকে অত্যন্ত গভীর চেনতাশ্রয়ী মাধ্যম বলে মনে করেন তাঁদের দিক থেকে এটি অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার। একটি নতুন এবং আন্তরিক সাহিত্যিক প্রচেষ্টার মূল্যায়ন তার উৎকর্ষোপকর্ষ নির্বিশেষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সেই দায়িত্বোধ থেকেই এই আলোচনার সূচনা।[২]

জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে অতিসংক্ষিপ্ত আলোচনা করে আহমাদ মাযহার তাঁর দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। এরপর সময় যত গড়িয়েছে ততই পাঠক-সমালোচকদের কাছে যুগপৎ এ-উপন্যাস ও এর লেখক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন স্ব-গুণে। তাই আজ আর বিভিন্ন গ্রন্থ-পত্রিকায় উপন্যাসটি নিয়ে লিখিত আলোচনা, সমালোচনা বা গবেষণা-প্রবন্ধ অপ্রতুল নয়। ডক্টর মোহাম্মদ আবদুর রশীদের সম্পাদনায় প্রকাশিত *শহীদুল জহির স্মারকগ্রন্থ*, লিটল ম্যাগাজিন *লোক* ও *শালুক*-এর শহীদুল জহির সংখ্যায় এ-উপন্যাসটি আলোচিত হয়েছে গুরুত্বের সাথে। হাসান আজিজুল হক তাঁর 'সোনা-মোড়া কথাশিল্প: শহীদুল জহির' প্রবন্ধে উপন্যাসটিকে চিহ্নিত করেছেন শহীদুল জহিরের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে :

> ... ১৯৮৯ সালে বেরুলো উপন্যাস 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা'। একেবারে প্রদীপ্ত যৌবনের রচনা। না কোনো খোকামি, না কোনো বালখিল্যতা, প্রখর পরিণত লেখকের লেখা উপন্যাস। বলতে ইচ্ছে হয়, এই লেখাটি আর তিনি কোনোদিনই অতিক্রম করতে পারেন নি, (ছোটগল্পের কথা এখানে হিসেবে ধরছি না) এমনি সুপরিণত, এমনি আবেগ আর বুদ্ধির টান টান ভারসাম্যে তা বাঁধা।[৩]

গবেষক নিপা জাহান তাঁর 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা : ইতিহাসের বিকল্প বয়ান' শীর্ষক প্রবন্ধে উপন্যাসটির ঐতিহাসিক সমালোচনার মাধ্যমে এর ভাবপরিমণ্ডল, বর্ণনাসূত্র, চরিত্রায়ণ ও ভাষাভঙ্গির বিশ্লেষণ করে শহীদুল জহির এ-উপন্যাসে ইতিহাসের যে বিকল্প বয়ান নির্মাণ করেছেন তার ওপর আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, '*জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা*র ইতিহাস রাজনৈতিক টেবিলওয়ার্কের কাছে বাঙালি চেতনার আপাত হেরে যাবার ইতিহাস।'[৪] অপরাপর সমালোচকও উপন্যাসটিতে শহীদুল জহিরের বিষয়স্বাতন্ত্র্য ও আঙ্গিকের অভিনবত্বকে তাঁদের

আলোচনার কেন্দ্রে রেখেছেন। কিন্তু দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আলোয় এর ক্ষমতা-কাঠামো বিশ্লেষণের সুযোগ থাকলেও কেউ-ই তা গ্রহণ করেননি।

ক্ষমতা-সম্পর্কের দুই রূপ : 'প্রভুত্ব' ও 'আধিপত্য'

মানুষ তার পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, এমনকি ধর্মীয় জীবনেও আবদ্ধ থাকে বিচিত্র ক্ষমতা-সম্পর্কের বেড়াজালে। কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) দাস, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিবাদী প্রভৃতি শ্রেণিবিভক্ত সমাজের অর্থনৈতিক ক্ষমতা-সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করেছিলেন যথাক্রমে দাসপ্রভু-দাস (slave owner-slave), ভূস্বামী-কৃষক (feudal lord-serf), পুঁজিপতি-শ্রমিক (bourgeoisie-proletariat) প্রভৃতি যুগ্ম-বৈপরীত্যের (binary-opposition) সাহায্যে।[৫] সৃজনশীল মার্কসবাদী চিন্তক আন্তোনিও গ্রামসি (১৮৯১-১৯৩৭) মার্কসীয় এই সমাজবীক্ষাকে আরও সম্প্রসারিত করেন। তিনি সকল শ্রেণিবিভক্ত সমাজস্থ প্রতিটি ক্ষমতা-সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করেছেন উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ (dominant- subaltern) যুগ্ম-বৈপরীত্যের সাহায্যে; যেখানে, বলা বাহুল্য, ক্ষমতার সম্পর্ক সূত্রে উচ্চবর্গের অধঃস্থ শ্রেণি নিম্নবর্গ।[৬]

প্রশ্ন হল, উচ্চবর্গ কী কৌশলে নিম্নবর্গের ওপর ক্ষমতা অর্জন ও প্রয়োগ করে? পূর্বে ক্ষমতাকে সর্বদা কেবল বল প্রয়োগ বা দমনের যন্ত্র হিসেবে দেখা হতো। বল প্রয়োগ ক্ষমতালাভ ও চর্চার আদিতম কৌশল হলেও গ্রামসির মতে, উচ্চবর্গ সবসময় যে কেবল বল প্রয়োগের মাধ্যমেই নিম্নবর্গকে তার কর্তৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য করে এমন নয়, বরং অনেকক্ষেত্রে নিম্নবর্গের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতির ভিত্তিতেও উচ্চবর্গ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, যেকোনো সমাজে একটি সামাজিক গোষ্ঠীর ওপর অপর গোষ্ঠীর প্রাধান্য দু-ভাবে প্রকাশিত হতে পারে : বল প্রয়োগ ও মতাদর্শগত সম্মতি। নিম্নবর্গের ওপর উচ্চবর্গের ক্ষমতা অর্জন এবং বজায় রাখার এই দ্বিবিধ কৌশল প্রসঙ্গে গ্রামসির বক্তব্য :

> The methodological criterion on which our own study must be based in the following: that the supremacy of a social group manifests itself in two ways, as "domination" and as "intellectual and moral leadership". A social group dominates antagonistic groups, which it tends to "liquidate", or to subjugate perhaps even by armed force; it leads kindred and allied groups. A social group can, and indeed must, already exercise "leadership" before winning governmental power (this indeed is one of the principal conditions for the winning of such power); it subsequently becomes dominant when it exercises power, but even if it holds it firmly in it's grasp, it must continue to "lead" as well.[৭]

গ্রামসি-কথিত 'domination'-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'প্রভুত্ব'; আর 'intellectual and moral leadership', যাকে গ্রামসি এক কথায় 'hegemony' শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপন করেছেন, এর বাংলা প্রতিশব্দ 'আধিপত্য'। 'প্রভুত্ব' হলো ক্ষমতার সেই রূপ যা অর্জিত হয় বল প্রয়োগ বা দমন-পীড়নের সাহায্যে। অপরদিকে মতাদর্শগত সম্মতির ভিত্তিতে অর্জিত ক্ষমতার রূপভেদ হল 'আধিপত্য'[৮]।

গ্রামসির মতে ক্ষমতা অর্জন ও অর্জিত ক্ষমতা ধরে রাখতে হলে যুগপৎ প্রভুত্ব ও আধিপত্য উভয়বিধ কৌশলই জারি রাখতে হয়। মার্কস-এঙ্গেলসের লেখায়ই বিপ্লব সফল করার জন্য চিন্তার জগতে জনগণকে আকৃষ্ট করার গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গিয়েছিল। তাঁরা লিখেছিলেন :

> The weapon of criticism cannot, of course, replace criticism of the weapon, material force must be overthrown by material force; but theory also becomes a material force as soon as it has gripped the masses.[৯]

নব্য-মার্কসবাদী চিন্তক লুই আলথুসারও (১৯১৮-১৯৯০) শক্তি-প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা-চর্চার পাশাপাশি 'আদর্শবাদের হাতিয়ার' ব্যবহার করে সম্মতি আদায়ের মাধ্যমে ক্ষমতা প্রয়োগের কথা বলেছেন :

> আলথুসার রাষ্ট্রের ক্ষমতা আর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ভেদরেখা টেনেছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্র দু'ভাবে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে: ১. দমনমূলক সংগঠনের (repressive structures) মাধ্যমে এবং ২. রাষ্ট্রীয় আদর্শবাদের হাতিয়ারের (state ideological apparatuses) মাধ্যমে। দমনমূলক সংগঠনসমূহের মধ্যে আছে পুলিশ, কোর্টকাচারি, জেলখানা, সেনাবাহিনী ইত্যাদি; আদর্শগত হাতিয়ার হল রাজনৈতিক দল, বিদ্যালয়, মিডিয়া, ধর্মীয় উপাসনালয়, পরিবারতন্ত্র এবং শিল্প-সাহিত্য।[১০]

আলথুসার-কথিত এই 'দমনমূলক সংগঠন' ও 'রাষ্ট্রীয় আদর্শবাদের হাতিয়ার' গ্রামসির রচনায় যথাক্রমে 'রাজনৈতিক সমাজ' (political society) ও 'সিভিল সমাজ' (civil society) হিসেবে অভিহিত হয়েছে।

গ্রামসির আধিপত্যের ধারণাটি মূলত মার্কসবাদীদের 'আইডিওলজি' (ideology) ধারণারই একটি 'সংশোধিত ব্যাখ্যা'। সাধারণত আইডিওলজি বলতে কোনো জনগোষ্ঠীর সচেতনভাবে ধারণকৃত যুক্তিগ্রাহ্য ধারণাপ্রপঞ্চকে বোঝালেও মার্কসবাদীদের মতে আইডিওলজি হল : 'যা জগৎকে আমাদের কাছে ভুলভাবে তুলে ধরে, যা সামগ্রিকভাবে সমাজের বাস্তবতাকে আমাদের চোখে ফুটে উঠতে দেয় না, অর্থাৎ সমাজবাস্তবতার চেতনাকে কুয়াশাচ্ছন্ন কিংবা রুদ্ধ করে।'[১১] ক্ষমতাবান শ্রেণি কতিপয় আইডিওলজির মাধ্যমেই ক্ষমতাহীনদের কাছ থেকে তাদের শাসন-শোষণ ও ক্ষমতা প্রয়োগের সম্মতি আদায় করে :

> মার্কসীয় তত্ত্বমতে সমাজের ভিত বা base-এর অংশ হল শ্রেণিসম্পর্ক, আর আইডিওলজি হল উপরিকাঠামোর অংশ। সমাজের প্রধানতম আইডিওলজিগুলোর মধ্যে আছে ধর্ম, আইন এবং রাজনৈতিক সিস্টেম। শাসকশ্রেণী যেহেতু উপরিকাঠামো নিয়ন্ত্রণ করে, তারাই এটাও ঠিক করে দেয় ঐ সমাজের রাজনৈতিক-আইনগত-ধর্মীয় আইডিওলজি কী হবে। ভেতরকাঠামোর অন্তর্গত অধঃশ্রেণীগুলোকে শেখানো হয়, এই আইডিওলজিগুলোর পালন ও পরিপোষণই তাদের জন্য আদর্শ। শাসকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য নিবেদিত হয় ঐ বিশেষ সমাজের আইডিওলজি, যা অধঃশ্রেণীকে বিভ্রান্তির জালে বেঁধে শোষণের প্রক্রিয়াকে বৈধতা দান করে, এমনকি মহিমান্বিত করে।[১২]

গ্রামসির পূর্বে মার্কসবাদে আধিপত্যের ধারণা পাওয়া যায় রুশ বিপ্লবী ভ্লাদিমির লেনিনের (১৮৭০-১৯২৪) রচনায়। অক্টোবর বিপ্লবের (১৯১৭) দ্বারা প্রবলভাবে উজ্জীবিত গ্রামসি মূলত বলশেভিকদের এই অবিসংবাদিত নেতার কাছ থেকেই আধিপত্য সম্পর্কিত ধারণার বীজ লাভ

করেছিলেন। লেনিন রাশিয়ার জারতন্ত্র-বিরোধী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে (১৯০৫) শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্ব প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে এই ধারণাটি প্রয়োগ করেন। প্রথম দিকে তিনি শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বকেই আধিপত্য হিসেবে দেখলেও পরবর্তীকালে তিনি শ্রেণি-সংগ্রামের বৃহত্তর পটভূমিতে বিষয়টিকে ঢেলে সাজান। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বুর্জোয়াদের ক্ষমতাকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখলের প্রয়াসে নিয়োজিত শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামের কর্তৃত্বকে যেমন লেনিন আধিপত্য হিসেবে অভিহিত করেছেন, তেমনি শ্রমিকশ্রেণি কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করার পর ক্ষমতা চর্চার একটি ধরন হিসেবেও আধিপত্যকে চিহ্নিত করেছেন।[১৩] গ্রামসি এই লেনিনীয় আধিপত্য তত্ত্বকে আরও ব্যাপক ও গভীরতর অর্থে উপস্থাপন করেছেন। তিনি শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবকে সফল করার জন্য বুর্জোয়া আধিপত্যের বিপরীতে 'পাল্টা-আধিপত্য' (counter-hegemony) প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্যের সারাৎসার হলো :

> বুর্জোয়া রাষ্ট্র যেমন স্বেচ্ছামূলক আনুগত্য এবং বলপ্রয়োগ তথা দমন-পীড়ন মারফত স্বীয় শ্রেণীর স্বার্থানুযায়ী সমাজকে চালিত করে, এই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবকে সার্থক করতে হলে, শ্রমিকশ্রেণীকেও তেমনই দ্বিবিধ অস্ত্র প্রয়োগ করতে হবে : প্রথমত, বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতি শ্রমিকশ্রেণী তথা অন্যান্য শ্রমজীবী শ্রেণীর স্বেচ্ছামূলক আনুগত্যকে নির্মূল করতে হবে এবং তার পরিবর্তে এইসব শ্রেণীর উপরে শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শগত প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে হবে, অর্থাৎ, শ্রমিকশ্রেণীকে জনগণের অন্যান্য অংশের স্বেচ্ছামূলক আনুগত্য অর্জন করতে হবে।[১৪]

লেনিন বলেছিলেন, রাশিয়ায় যেভাবে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশগুলোতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তত সহজে হতে পারবে না। কারণ, ঐসব পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে ইতোমধ্যেই ধনতান্ত্রিক মতাদর্শ আধিপত্য বিস্তার করেছে।[১৫] গ্রামসি লেনিনের এই বক্তব্যের সংশ্লেষে বলেন, এই সকল রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক আধিপত্যের বিপরীতে শ্রমিকশ্রেণির চিন্তা ও আদর্শগত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই কেবল বলপ্রয়োগের দ্বারা শোষকশ্রেণির রাষ্ট্রক্ষমতা উচ্ছেদের প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। 'একটি কেন্দ্রীয় অভ্যুত্থানের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হবে এই ধারণার পরিবর্তে গ্রামশি বলেছেন এক দীর্ঘমেয়াদী কৌশলের কথা, যেখানে রাষ্ট্রযন্ত্রের শীর্ষস্তরে নয়, বরং নাগরিক সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভেতরে শ্রমিকশ্রেণী তার বিকল্প সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে।'[১৬]

ক্ষমতা প্রসঙ্গে মার্কসবাদী তাত্ত্বিকগণের উপর্যুক্ত বক্তব্যাবলির সমন্বয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কেবল বল প্রয়োগের সাহায্যে আশু ক্ষমতালাভ সম্ভব হলেও যুগপৎ আধিপত্যবাদী হয়ে উঠতে না পারলে সেই ক্ষমতাকে কখনোই টেকসই করা যায় না; আধিপত্যহীন প্রভুত্ববাদী ক্ষমতা হলো ক্ষমতার এক খণ্ডিত, অসম্পন্ন ও ফাঁপা অধ্যাসমাত্র। এই তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিত্তিতে প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে শহীদুল জহিরের *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* উপন্যাসে বর্ণিত সমাজের সামাজিক ক্ষমতা-সম্পর্কসমূহ বিশ্লেষিত হয়েছে এবং সেই সূত্রে মহল্লাটির ক্ষমতাকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত বদরুদ্দিনের ক্ষমতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে।

জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা উপন্যাসে ক্ষমতা-সম্পর্ক

জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা উপন্যাসে যে মহল্লার কাহিনি বিধৃত হয়েছে তার সামাজিক ক্ষমতা-কাঠামোর কেন্দ্রে আছে মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব সময়ে একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য, যুদ্ধ-চলাকালে

রাজাকার বাহিনীর সর্দার এবং যুদ্ধোত্তর কালে ঐ একই রাজনৈতিক দলের বড় নেতায় পরিণত হওয়া বদরুদ্দিন মওলানা, আর তার প্রান্তে অবস্থান করছে মহল্লাবাসী সাধারণ জনতা। বৃত্তের ব্যাসার্ধের ন্যায় যে ক্ষমতা-সম্পর্কগুলো ক্ষমতা-কাঠামোর বৃত্তটিকে গঠন করেছে তার কেন্দ্রস্থ প্রান্তে ধ্রুবকের মতো অবস্থান করছে বদরুদ্দিন, আর পরিধিস্থ প্রান্তসমূহে আছে আবদুল মজিদ ও তার পরিবার, কিশোর আলাউদ্দিন ও তার মা, খাজা পরিবার, আবু করিমের বড় ছেলে, জমির ব্যাপারী, বদরুদ্দিনের স্ত্রী লতিফা, ইসমাইল হাজাম প্রমুখ মহল্লাবাসী চরিত্র।

যে ক্ষমতার সম্পর্কে বদরুদ্দিন ও মহল্লাবাসী জনতা পরস্পর সম্পর্কিত তাতে বদরুদ্দিন 'উচ্চবর্গ' হিসেবে চিহ্নিত এবং তার সাপেক্ষে অন্যান্য মহল্লাবাসী জনতাকে চিহ্নিত করা যায় 'নিম্নবর্গ' হিসেবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষশক্তি-বিপক্ষশক্তি, এই মৌল যুগ্ম-বৈপরীত্যেই উপন্যাসটির ক্ষমতাকেন্দ্রিক দ্বান্দ্বিকতার বিস্তরণ ঘটেছে। তবে প্রগতিশীল-প্রতিক্রিয়াশীল, অর্বাচীন-প্রাচীন, হিন্দু-মুসলমান, নারী-পুরুষ প্রভৃতি যুগ্ম-বৈপরীত্যও যুগপৎ ক্রিয়াশীল থেকেছে ক্ষমতা-সম্পর্কগুলো বিনির্মাণে। বলা বাহুল্য, প্রতিটি যুগ্ম-বৈপরীত্যের প্রথম ভুক্তির প্রতিনিধি মহল্লাবাসী জনতা আর দ্বিতীয় ভুক্তির প্রতিনিধি বদরুদ্দিন। অবশ্য উপন্যাসের কাহিনি-সূত্রের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বদরুদ্দিনের ক্ষমতাকেন্দ্র অনড় থাকেনি; অপর প্রান্তের আলোড়ন-আন্দোলনে বারবার টলে উঠেছে। আর মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর পরাজয়ে চূড়ান্তভাবে বদরুদ্দিন মহল্লার ক্ষমতা-কাঠামোর বৃত্ত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেছে। তবে যুদ্ধ-পরবর্তী পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে স্বল্পকালের মধ্যেই সে কৌশলে পুনরায় ক্ষমতাবৃত্তে প্রবেশ করে তার হারানো ক্ষমতাকেন্দ্রটি পুনরুদ্ধার করেছে।

উল্লেখ্য, যুদ্ধকালে বদরুদ্দিনের ক্ষমতার মূল উৎস পাকিস্তানি মিলিটারি উক্ত মহল্লার সামাজিক ক্ষমতা-সম্পর্কে অংশগ্রহণ করেছে খুব সামান্যই। সমগ্র উপন্যাসে মহল্লায় মিলিটারি এসেছে দুইবার; প্রথমবার যেন বদরুদ্দিনকে খুঁজে বের করার জন্যই তারা মহল্লায় এসেছিল, আর দ্বিতীয়বার এসেছিল বদরুদ্দিনের আহ্বানে মহল্লায় তার ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করতে। মহল্লার অপর ব্যক্তি, যে অন্তত যুদ্ধের পর বদরুদ্দিনের ক্ষমতাকেন্দ্রের বিকল্প হয়ে উঠতে পারত, সেই আজিজ পাঠান চরিত্রটিকেও ঔপন্যাসিক বিকশিত করেননি। যুদ্ধোত্তর কালে মহল্লার ক্ষমতা-সম্পর্কে বদরুদ্দিনের পুনঃপ্রবেশের ছাড়পত্র প্রদানের মধ্যেই উপন্যাসে তার ভূমিকা সীমাবদ্ধ থেকেছে। মহল্লার মুক্তিযোদ্ধারাও সে অর্থে এর সামাজিক ক্ষমতা-সম্পর্কে অংশগ্রহণ করেনি। মহল্লার তিনজন মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে বাবুল ও আলমগীরের কেবল নাম উল্লেখিত হয়েছে। অপর শহিদ মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সেলিমের আখ্যান কিছুটা বিস্তৃত হলেও তা থেকে মুখ্যত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি মহল্লাবাসীর দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের সিংহভাগ জুড়ে ঔপন্যাসিক বদরুদ্দিনের ওপরই আলোকসম্পাত করেছেন এবং তার বিপরীত যুগ্মতায় উপস্থিত করেছেন মহল্লাবাসী সাধারণ জনতাকে। তাই, মূলত, বদরুদ্দিন ও মহল্লাবাসী জনতাকে নিয়েই মহল্লার সামাজিক ক্ষমতা-সম্পর্কটি গড়ে উঠেছে।

ক্ষমতা-সম্পর্কের রূপ-রূপান্তর

১

উপন্যাসটির কাহিনির সিংহভাগ জুড়ে আছে যুদ্ধকালীন ঘটনাবলি। তবে উপন্যাসভুক্ত যুদ্ধ-পূর্ববর্তী দু'টি ঘটনা থেকে যুদ্ধ শুরুর পূর্বে মহল্লাবাসীর সাথে বদরুদ্দিনের সম্পর্ক তথা মহল্লার ক্ষমতা-সম্পর্কের স্বরূপ কী ছিল তা বুঝে নেয়া সম্ভব। প্রথম ঘটনাটি যুদ্ধের বেশ কয়েক বছর পূর্বের।[১৭] একদিন স্কুলের অনুষ্ঠানে গান গেয়ে ফেরার সময় আবদুল মজিদের বড় বোন মোমেনাকে বদরুদ্দিন 'মাগি, ডিম পারবার যাও' বলে গাল দেয়। বদরুদ্দিনের এই প্রতিক্রিয়াশীল আচরণের কার্যকারণ ছিল মোমেনার সংগীতচর্চা ও অসাম্প্রদায়িক জীবনচর্যা। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন :

> তখন এই লক্ষ্মীবাজার এলাকায় মোমেনা ছিল একমাত্র মুসলমান মেয়ে যে গান গাইত। বাসন্তী গোমেজের সঙ্গে তার ভাব ছিল। আর বাসন্তী গোমেজ তাকে সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুলের চার্চে প্রার্থনা-সঙ্গীতে অংশগ্রহণের জন্য নিয়ে যেত।[১৮]

রাস্তায় বদরুদ্দিন মোমেনাকে গাল দিলে ঘরে ফিরে মোমেনা 'কয় কি, ডিম পারবার যাও। হারামির পোলা আমারে কয় কি, মাগি, ডিম পারবার যাও' বলে বিলাপ করেছিল। আবদুল মজিদ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল 'কান্দিচ না আপা, মান্দারপোর থোতা ফাটায়া দিয়া আমুনে।'[১৯] যুদ্ধ-পূর্ববর্তী সময়ে বদরুদ্দিন যে মহল্লার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিল না, তা মোমেনা ও আবদুল মজিদের এইসব সংলাপ থেকে আঁচ করা যায়।

যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে সংঘটিত উপন্যাসভুক্ত দ্বিতীয় ঘটনাটি উক্ত ধারণার পক্ষে আরও জোরালো যুক্তি দাঁড় করায়। মহল্লায় মিলিটারি আসার তিনমাস নয় দিন পূর্বে তেরো বছরের কিশোর আলাউদ্দিন দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করায় বদরুদ্দিন তাকে 'হারামযাদা, খাঁড়ায়া খাঁড়ায়া মোতচ, খাঁড়ায়া মোতে কুত্তা' বলে শাসায়। প্রতিউত্তরে আলাউদ্দিন 'গালের ভেতর জিভ নেড়ে তাকে ভেঙায়, তারপর বলে, কুত্তা তো মুখ দিয়া খায়বি, আপনে অখনথন হোগা দিয়া খায়েন।'[২০] মহল্লায় মিলিটারি আগমনের পূর্বে আলাউদ্দিনের এই ঔদ্ধত্যের শাস্তিস্বরূপ তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া বদরুদ্দিনের পক্ষে সম্ভব হয়নি; যেমনটা সম্ভব হয়নি অশ্লীল কটূক্তি করা ছাড়া মোমেনার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়াও। বদরুদ্দিনের 'মাগি', 'হারামযাদা' সম্বোধনের প্রতিউত্তরে মোমেনা-মজিদ-আলাউদ্দিনরা তাকে 'হারামির পোলা', 'মান্দার পো' বলেই সম্বোধন করেছে। এ-থেকে বোঝা যাচ্ছে, যুদ্ধ-পূর্বকালে বদরুদ্দিন মহল্লার ক্ষমতা-কাঠামোর কেন্দ্রে সমাসীন ছিল না। তবে মহল্লার ক্ষমতাকেন্দ্রে আসীন হওয়ার অভিলাষ ও প্রয়াস তখন থেকেই তার কর্মকাণ্ডে প্রকট হয়েছিল।

২

যুদ্ধ শুরুর পর পাকিস্তানি মিলিটারির সাহায্যকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বদরুদ্দিন মহল্লার ক্ষমতা-কাঠামোর কেন্দ্রে আসীন হয় : 'মহল্লার লোকেরা বলে যে, মহল্লায় প্রথমবার মিলিটারি আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বদু মওলানাকে খুঁজে বের করা; বদু মওলানা প্রথমেই 'হাজির হুজুর' বলে উঠে দাঁড়িয়েছিল এবং তারপর মহল্লার লোকেরা তাকে চিনেছিল মহল্লার দণ্ডমুণ্ডের মালিকরূপে।'[২১] এভাবে ক্ষমতাকামী একজন সাধারণ ব্যক্তি, যে কিনা কিছুদিন পূর্বেও মহল্লার

রাস্তায় দাঁড়িয়ে কিশোর-কিশোরীদের সাথে কুরুচিপূর্ণ বাক্য-বিনিময় করেছে, মিলিটারির সাথে যোগসাজশে রাতারাতি মহল্লার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। যুদ্ধের নয় মাস বদরুদ্দিন মহল্লাবাসীর ওপর যে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে তা সম্পূর্ণত বল প্রয়োগ ও দমন-পীড়নের মাধ্যমে অর্জিত প্রভুত্ববাদী ক্ষমতা। যে-ই তার একচ্ছত্র ক্ষমতার প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছে তাকেই সে বল প্রয়োগের মাধ্যমে অবদমিত করেছে।

বদরুদ্দিনের যুদ্ধকালীন প্রভু-শক্তির প্রথম বলি হয়েছে পূর্বোক্ত কিশোর আলাউদ্দিন। যুদ্ধ-পূর্ববর্তী ক্ষমতাহীনতার কারণে যার স্পর্ধার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হয়নি বদরুদ্দিন, যুদ্ধ শুরুর পরপরই নবলব্ধ প্রভুত্ববাদী ক্ষমতাবলে তাকে ধরাশায়ী করতে সক্ষম হয় সে। যুদ্ধ শুরুর পর মহল্লায় প্রথম নিহত হয় আলাউদ্দিন, '...যেদিন প্রথম বদু মওলানা এবং ক্যাপ্টেন ইমরান পরস্পরকে আবিষ্কার করে, আলাউদ্দিনের প্রাণ-বিযুক্ত দেহ মহল্লায় তাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় চিৎ হয়ে আছড়ে পড়ে'।[২২]

একই দিনে বদরুদ্দিনের প্রত্যক্ষ মদদে মিলিটারি আলাউদ্দিনসহ মহল্লার যে সাতজনকে হত্যা করে তাদের মধ্যে খাজা আহমেদ আলী ও তাঁর ছেলে খাজা শফিকও বদরুদ্দিনের ক্ষমতালিপ্সার বলি। পঁচিশে মার্চের গণহত্যার পর একদিনের জন্য সন্ত্রস্ত মহল্লাবাসী সকলেই মহল্লা ত্যাগ করলেও বদরুদ্দিন ছাড়া দ্বিতীয় যে ব্যক্তি মহল্লায় থাকার সাহস দেখিয়েছিলেন তিনি আহমেদ আলী। সেদিন সন্ধ্যায় লক্ষ্মীবাজারে একমাত্র তিনিই বাতি জ্বালিয়েছিলেন। এছাড়া বদরুদ্দিনের কাকের উদ্দেশে ছুড়ে দেওয়া নরমাংসের টুকরো পেয়ে পুত্রের সহায়তায় সেটি নিজের বাড়ির আঙিনায় দাফন করেছিলেন আহমেদ আলী এবং তাঁর কাছ থেকে মহল্লাবাসী বিষয়টি অবগত হয়েছিল। মহল্লার সবচেয়ে প্রাচীন মুসলমান পরিবারের প্রধান এই বৃদ্ধ মহল্লাবাসীর বিশেষ সম্মানেরও পাত্র ছিলেন। মিলিটারির গুলিতে পুত্রের মৃত্যু হলে তিনি বাড়ির ছাদে গিয়ে যে আজান দিয়েছিলেন তার বর্ণনাতে মহল্লাবাসীর কাছে তাঁর বিশেষ মর্যাদার স্থানটি সম্পর্কে জানা যায় :

> এবং তারা যখন জানতে পারে যে খাজা আহমেদ আলী ছিল সেই ঝঞ্ঝাকালের মুয়াজ্জিন, তারা সকলেই বলে যে, তারা যখন আজান শুনেছিল তারা তার কণ্ঠ চিনতে পেরেছিল। তারা সকলেই বলে যে, এমন মধুর স্বরে আজান দেয়া তারা ইতিপূর্বে কখনো শোনে নাই এবং তারা মনে করেছিল, বেলালের কণ্ঠই কেবল এমন হতে পারে।[২৩]

খাজা আহমেদ আলীর মহল্লায় অবস্থিতির সাহস, বদরুদ্দিনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগতি ও তাঁর প্রতি মহল্লাবাসীর সম্মানবোধকে বদরুদ্দিন তার ক্ষমতাকেন্দ্রের জন্য হুমকি হিসেবেই বিবেচনা করেছে। তাই বদরুদ্দিনের রোষের শিকার হয়েছেন আহমেদ আলী ও তাঁর পুত্র ।

কাকের উদ্দেশে ছুড়ে দেয়া নরমাংসের অন্য দুটি টুকরো পেয়েছিল জনৈক পথিক ও জমির ব্যাপারীর কিশোরী কন্যা। পথিকের প্রাপ্ত হিজড়ার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলের টুকরোটি আবু করিমের বড় ছেলে দেখেছিল এবং তার মারফত মহল্লাবাসী বিষয়টি জেনেছিল। পরবর্তীকালে আবু করিমের বড় ছেলেটি নিখোঁজ হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাজাকার আবদুল গণির কাছ থেকে জানা যায়, ছেলেটিকে তারা বদরুদ্দিনের নির্দেশে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে জবাই করেছিল। নরমাংসের অপর টুকরো, যেটি পেয়েছিল জমির ব্যাপারীর কন্যা, সেটি ছিল একটি কাটা পুরুষাঙ্গ। জমির ন্যাকড়ায়

জড়িয়ে কাটা পুরুষাঙ্গটি বদরুদ্দিনের বাসায় দিয়ে এসে তার ক্ষমতাকেন্দ্রে যে আঘাত হানে, তা প্রতিহত করতে পরদিন সকালে বদরুদ্দিন সমবেত মহল্লাবাসীর সামনে তাকে চপেটাঘাত করে। বিপদ বুঝতে পেরে জমির সেদিনই সপরিবার মহল্লা ত্যাগ করে প্রাণ বাঁচায় এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বে মহল্লায় ফিরতে পারে না।

জমির ব্যাপারীর দিয়ে যাওয়া পুরুষাঙ্গটিকে কেন্দ্র করে বদরুদ্দিনের ক্ষমতাকেন্দ্রটি আরও একবার সূক্ষ্ম আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল তারই অন্তঃপুরের এক সদস্যের কর্মকাণ্ডে। জমির-প্রদত্ত ন্যাকড়ায় জড়ানো বস্তুটির মোড়ক উন্মোচন করেছিল বদরুদ্দিনের স্ত্রী লতিফা। প্রথমে ভয় পেলেও পরবর্তীতে লতিফা সেটিকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে আগ্রহী হয় এবং শেষ পর্যন্ত বস্তুটি যে একজন মুসলমানের পুরুষাঙ্গ তা শনাক্ত করতে সক্ষম হয়। এই ঘটনা বদরুদ্দিনকে হতবাক করে এবং রাতেই ঘুম থেকে তুলে সে লতিফাকে তালাক দেয় :

> সে বুঝতে পারে, লতিফা, অপরিচিত একজন পুরুষের যৌনাঙ্গ অবলোকন শুধু করে নাই, এ ব্যাপারে সে অনেক আগ্রহ দেখিয়েছে; সে সেটাকে পুরুষের যৌনাঙ্গ হিসেবে শনাক্ত করেছে। তার পরেও সে ছাড়ে নাই, সে শনাক্ত করেছে যে, সেটা মুসলমানের।[২৪]

লক্ষণীয়, লতিফা বদরুদ্দিনের দ্বিতীয় স্ত্রী এবং সে যে বদরুদ্দিনের তুলনায় 'তরুণী' ঔপন্যাসিক তা বিশেষভাবে স্পষ্ট করেছেন। অন্য পুরুষের যৌনাঙ্গ সম্পর্কে লতিফার আগ্রহের একটি সম্ভাব্য কারণ হয়ত তার তরুণীসুলভ কৌতূহল; কিন্তু বদরুদ্দিন নিশ্চয়ই সে কারণে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার মতো অতটা বিচলিত হয়নি। বরং এই ঘটনা বদরুদ্দিনের পুরুষতান্ত্রিক মানসজগতে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে তা, সম্ভবত, তার এই 'তরুণী' স্ত্রীর সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপনের অক্ষমতাজাত। নারীবাদী তত্ত্বমতে, পুরুষের ধর্ষকামীতার বিপরীতে নারীর মর্ষকামীতা মনস্তাত্ত্বিকভাবে নারীকে পুরুষের কর্তৃত্বপরায়ণতা মেনে নিতে প্রভাবিত করে।[২৫] তাই ক্ষমতাবান বদরুদ্দিনের নিজ ধর্ষকাম-অক্ষমতাকে তার ক্ষমতার বিরুদ্ধে হুমকিস্বরূপ মনে করাটা অস্বাভাবিক নয়। তালাক প্রদানের মাধ্যমে লতিফাকে মহল্লা থেকে বিতাড়িত করে এই হুমকি প্রতিরোধে সচেষ্ট হয়েছে সে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুংজননেন্দ্রিয় ক্ষমতার টোটেম হিসেবে পরিগণিত হয়। অধুনা দেবতা শিবের বিগ্রহ হিসেবে পূজিত শিবলিঙ্গকেও অনেক গবেষক পুরুষাঙ্গের অনুষঙ্গবাহী বলে মত দিয়েছেন।[২৬] পুরুষদেহে শিশ্নের উপস্থিতির বিপরীতে নারীদেহে তার অনুপস্থিতিকে নারীর হীনমন্যতার অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন মনস্তত্ত্ববিদ সিগমুন্ড ফ্রয়েড। শিশ্ন-কেন্দ্রিক এই অসমতা শৈশবেই নারী-পুরুষ উভয়ের কাছে ধরা পড়ে। ফ্রয়েড লিখেছেন :

> In the course of these researches the child arrives at the discovery that the penis is not a possession which is common to all creatures that are like himself. An accidental sight of the genitals of a little sister or playmate provides the occasion for this discovery... . The lack of a penis is regarded as a result of castration, and so now the child is faced with the task of coming to terms with castration in relation to himself. ...We know, too, to what a degree depreciation of women,

horror of women, and a disposition to homosexuality are derived from the final conviction that women have no penis.[২৭]

ছেলেশিশু ও মেয়েশিশু উভয়েই ভাবে পূর্বে দুজনেরই পুরুষাঙ্গ ছিল, নপুংসীকরণের (castration) ফলে মেয়েশিশুটি তার পুরুষাঙ্গটি হারিয়েছে। এজন্য মেয়েশিশুটি ছেলেশিশুটির লিঙ্গ দেখে ঈর্ষান্বিত হয় এবং হীনমন্যতায় ভুগতে শুরু করে। অর্থাৎ, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষাঙ্গহীনতা এক প্রকার অক্ষমতা হিসেবে চিহ্নিত হয়।

উপর্যুক্ত কারণেই নিজ সন্তানের পুরুষাঙ্গহীনতার ব্যাপারে নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তা রক্ষার চেষ্টা করতে দেখা যায় বদরুদ্দিনকে। নপুংসক সন্তান আবুল বাশারের এই পঙ্গুত্ব গোপনের জন্য জন্মের পর ছয় বছর সে শিশুটিকে শ্বশুরবাড়িতে রেখে দেয় এবং সেখান থেকে নিয়ে আসার পর তাকে সবসময় কাপড় পরিয়ে রাখে। তাতে মহল্লাবাসীর সন্দেহ আরও প্রগাঢ় হলে সে যুদ্ধের মধ্যেই ইসমাইল হাজামকে ডেকে মহল্লাবাসীর সামনে বাশারের খতনার নাটক মঞ্চায়ন করে এবং পুত্রের পুরুষাঙ্গহীনতার বিষয়ে মুখ বন্ধ রাখার জন্য ইসমাইলকে কঠোর নির্দেশ দেয়। ইসমাইল মহল্লাবাসীর সামনে নীরবতা পালন করলেও নিজের ভাবমোক্ষণের জন্য নিম্নস্বরে 'হালার হিজড়ার আবার মুসলমানি!' স্বগতোক্তি করে বসে। তার এই স্বগতোক্তি রাজাকার আবদুল গণির কর্ণগোচর হলে এবং গণি বিষয়টি বদরুদ্দিনকে জানালে বদরুদ্দিনের নির্দেশে সে-রাতেই তাকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে জবাই করা হয়।

বদরুদ্দিনের ক্ষমতাকেন্দ্রের জন্য সবচেয়ে প্রবল হুমকি হয়ে উঠেছিল আবদুল মজিদের পরিবার। যুদ্ধের পূর্বেই মজিদের বোন মোমেনার কর্মকাণ্ডকে নিজের ক্ষমতালিপ্সার বিরুদ্ধে এক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখার কারণে বদরুদ্দিন তাকে কটুকাটব্য করেছিল। এরপর যুদ্ধ শুরু হলে সে মজিদের বিধবা মাকে 'এই মহল্লায় এখনো তাদেরই কেবল সাহস রয়ে গেছে' বলে শাসিয়েছে। বস্তুত বদরুদ্দিনের প্রতি জন্মানো ঘৃণা ও সেই ঘৃণাজাত ক্রোধের সাহসকেও বদরুদ্দিন তার ক্ষমতার জন্য হুমকিস্বরূপ মনে করেছে। এছাড়া আরও একটি সাহসিকতা দেখিয়েছিল মজিদ। জমির ব্যাপারীর দিয়ে যাওয়া খণ্ডিত পুরুষাঙ্গের জের ধরে যে রাতে বদরুদ্দিন লতিফাকে তালাক দেয়, সে রাতে লতিফার করুণ কান্নার শব্দে সারারাত মহল্লাবাসী 'বাতি না জ্বেলে' অন্ধকারে জেগে থাকলেও 'একবার অসহ্য লাগলে কিশোর আবদুল মজিদ বাতি জ্বালে'। মহল্লাবাসীকে যে ভয়ের অন্ধকারে নিমজ্জিত করে বদরুদ্দিন তার প্রভুত্ববাদী ক্ষমতাকে টিকিয়ে রেখেছিল, তার মধ্যে এই আলোক-প্রজ্বালন নিশ্চয়ই তাকে বিচলিত করেছিল; এর সাথে খাজা আহমেদ আলীর জনমানবশূন্য মহল্লায় সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বালানোর প্রতীকী তাৎপর্য অভিন্ন।

যুদ্ধ-চলাকালে বদরুদ্দিনের রাজাকার বাহিনী মহল্লাকে তুলসীগাছ-শূন্য করার অভিযান চালানোর সময় একজন রাজাকার আবদুল মজিদদের আঙিনার জবা ফুলগাছকেও 'হিন্দু গাছ' হিসেবে চিহ্নিত করে তা বিনষ্ট করতে উদ্যত হলে মোমেনা বাধা দেয়। রাজাকারটি তার কথায় কর্ণপাত না করলে

মোমেনা রান্নাঘর থেকে কাটারি নিয়ে এসে তাকে তাড়া করে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। তার এই প্রতিবাদ মহল্লাবাসীকে রাজাকারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করে এবং প্রথমবারের মতো জনৈক মহল্লাবাসী একজন রাজাকারকে চড় মারে। তার রাজাকার বাহিনীর বিরুদ্ধে মহল্লাবাসীর এই সম্মিলিত প্রতিরোধ বদরুদ্দিনের কাছে তার ক্ষমতাকেন্দ্রে আঘাত বলেই প্রতীয়মান হয় এবং তা প্রতিহত করতে সে দ্বিতীয়বার মহল্লায় মিলিটারি নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয় :

> এই বিষয়টি পরে জানা গিয়েছিল যে, বদু মওলানা রাজাকারদের কাছ থেকে সব শুনে বিচলিত হয়ে পড়ে এই কারণে যে, সে পুরো জিনিসটার ভেতর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া সাহসের এক পুনরুত্থানের ইঙ্গিত যেন দেখতে পায়। তার মনে হয়, মহল্লার লোকদের আর একবার মিলিটারি দেখানো প্রয়োজন।[২৮]

মহল্লাবাসীকে দ্বিতীয়বার মিলিটারি দেখিয়ে নিজের প্রভুত্ববাদী ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করে নেয় বদরুদ্দিন। কিন্তু মোমেনাকে সে ছাড় দেয়না। সেদিন ও পরবর্তী কয়েকমাস চাতুর্যের আশ্রয়ে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হলেও শেষ রক্ষা হয় না মোমেনার। বদরুদ্দিনের রাজাকার বাহিনী দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে তাকে তাদের ঘরের চৌকির তলা থেকে বের করে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। এভাবে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস বদরুদ্দিন দমন-পীড়নের মাধ্যমে মহল্লায় প্রভুত্ববাদী ক্ষমতার চর্চা করেছে।

৩

যুদ্ধে পরাজয়ের পর বদরুদ্দিন দুই বছর আত্মগোপনে থেকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর ১৯৭৩ সালে মহল্লায় প্রত্যাবর্তন করে। মিলিটারির সাথে যোগসাজশে লব্ধ তার ভূতপূর্ব প্রভুত্ববাদী ক্ষমতা তখন সম্পূর্ণ হৃত। তাই এবার সে মহল্লায় তার ক্ষমতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করতে নতুন কৌশলের আশ্রয় নেয়। তার আচরণে এখন আর যুদ্ধকালীন সেই প্রভু-শক্তির দোর্দণ্ড প্রতাপ লক্ষ করা যায় না। মহল্লার ক্ষমতাকেন্দ্রে পুনরায় সমাসীন হওয়ার জন্য এখন সে বল প্রয়োগের পরিবর্তে মহল্লাবাসীর সম্মতি আদায় করে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় অধিক সচেষ্ট হয়। এক বিনীত, সৌম্য বদরুদ্দিন ধরা দেয় মহল্লাবাসীর কাছে : 'এবার বদু মওলানা যেন পুনরায় শূন্য থেকে শুরু করে, মহল্লার লোকেরা তাকে পুনরায় মাটির দিকে তাকিয়ে হেঁটে যেতে দেখে। ফিরে আসার পর প্রথম দিন সে মহল্লার সকলের সঙ্গে বিনীতভাবে কুশল বিনিময় করে'।[২৯]

বদরুদ্দিনের হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের প্রথম হাতিয়ার তার লেবাস। তাই 'বদু মওলানা যখন লক্ষ্মীবাজারে ফিরে আসে মহল্লার লোকেরা তার গায়ে পুনরায় পপলিনের ধূসর সেই আলখাল্লা দেখতে পায়'।[৩০] এই আলখাল্লা সে পূর্বেও পরিধান করত। তবে পঁচিশে মার্চের পর সে হঠাৎ কাঁধে একটি কালো খোপ খোপ চেকের স্কার্ফ ঝুলিয়েছিল। স্কার্ফটি ছিল রাজাকার বাহিনীর প্রধান হিসেবে পাকিস্তানি মিলিটারির সহায়তায় মহল্লাবাসীর ওপর অর্জিত তার প্রভুত্ববাদী ক্ষমতার স্মারক। ফলে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে প্রভুত্ব হারানোর সঙ্গে সঙ্গে এই স্মারকটিও তার কাঁধ থেকে অন্তর্হিত হয়। তবে, থেকে যায় আলখাল্লাটি; যার মাধ্যমে সে নিজের প্রতি মহল্লাবাসীর সম্মানবোধ জাগ্রত করে সম্মতিমূলক আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছে।

সমুদ্রযাত্রার মাধ্যমে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যরাজিই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের এসব অঞ্চলে ঔপনিবেশিক আধিপত্য বিস্তারের প্রধান হাতিয়ার হয়েছিল। সামরিক শক্তির পরিবর্তে তথ্য-শক্তির বলে বিশ্বকে করায়ত্ত করার এই সাম্রাজ্যবাদী কৌশল বদরুদ্দিন প্রয়োগ করেছে মহল্লাবাসীর ওপর। যুদ্ধ চলাকালে দেখা গিয়েছিল বদরুদ্দিনের রাজাকার বাহিনীর সদস্য আবদুল গণি 'একজন সতর্ক রাজাকার হিসেবে এমনকি হাওয়ার গতিপ্রবাহ সম্পর্কেও' তাকে সব সময় অবহিত রাখত। মহল্লায় প্রত্যাবর্তনের পর বদরুদ্দিন প্রথমেই যুদ্ধের সময় তার প্রত্যক্ষ মদদে নিহতদের পরিবারের সাথে কুশল বিনিময় করতে যায়। সে বুঝতে পেরেছিল, মহল্লায় তার আধিপত্যবাদী হয়ে ওঠার পথে প্রধান অন্তরায় হবে এই যুদ্ধে স্বজনহারা পরিবারগুলোই। তাই তাদের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যই বদরুদ্দিন তাদের প্রাঙ্গণে গিয়ে হাজির হয়। পরবর্তীকালে এই পরিবরিগুলোর ওপর কঠোর নজরদারি করতেও দেখা যায় তাকে। যেমন, আবদুল মজিদের শিশুকন্যার নাম মোমেনা রাখার ব্যাপারটি মহল্লাবাসী আদৌ জানে কি না তা জানা না- গেলেও বদরুদ্দিন একদিন আবদুল মজিদকে 'রাস্তায় থামিয়ে তার বাচ্চা মেয়ের কুশল জিজ্ঞাসা করে এবং তারপর বলে, বইনের নামে নাম রাকছো, বইনেরে ভুলো নাইকা?'[৩১]

বদরুদ্দিন যারপরনাই বিনয় প্রদর্শনের পরও মহল্লার ক্ষমতাকেন্দ্রে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করার ব্যাপারে যুদ্ধে স্বজনহারা পরিবারগুলোর কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পায় না। তাই মহল্লায় প্রত্যাবর্তনের দ্বিতীয় দিন ভোরে সে গিয়েছিল আজিজ পাঠানের কাছে। আজিজ পাঠানের সামনেও সে বিনীত ভঙ্গিতেই নিজেকে উপস্থাপন করে :

> লুঙ্গি এবং স্যান্ডো গেঞ্জির ওপর চাদর জড়িয়ে আজিজ পাঠান যখন দাঁত ব্রাশ করতে করতে বাইরের ঘরে আসে তখন বদু মওলানা অপরাধীর মতো দাঁড়িয়েছিল; তার পরস্পরকে আঁকড়ে থাকা হাত দুটো ছিল সামনের দিকে তলপেটের নিচে ঝোলানো, আর দৃষ্টি ছিল পাঠানের ঘরের চামড়া ওঠা, চল্টানো পাকা মেঝের ওপর। মহল্লার লোকেরা পরে শুনেছিল যে, বদু মওলানা একটি কথাও আজিজ পাঠানের সামনে উচ্চারণ করে নাই, সে শুধু দাঁড়িয়েছিল নিশ্চুপ এবং বাঁকা হয়ে।[৩২]

বস্তুত, মহল্লার ক্ষমতা-কাঠামোতে পুনঃপ্রবেশ ও ক্ষমতাকেন্দ্রে সমাসীন হওয়ার জন্য যে বৈধতার (legitimacy) প্রয়োজন ছিল বদরুদ্দিনের, সেটি সংগ্রহ করতেই সে আজিজ পাঠানের কাছে গিয়েছিল। তার এই বিনম্র ভাব ও চোখের পানি এক কৌশলমাত্র। দলীয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণে আজিজ পাঠান তাকে ক্ষমাসূচক উক্তি করলে সেটিকেই মূলধন করে বদরুদ্দিন তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার নতুন কর্মপ্রক্রিয়ায় অগ্রসর হয়। আজিজ পাঠানের স্বীকৃতিকে সে ব্যবহার করে আত্মরক্ষার শিখণ্ডী হিসেবে; সদর্পে আজিজ পাঠানের এই সম্মতির ব্যাপারটি ঘোষণা করে মহল্লাবাসীর কাছে :

> মহল্লার লোকেরা জানতে পারে যে, বদু মওলানা এই কথা বলে যে, একমাত্র মানী লোক-ই মানীর সম্মান রাখতে জানে। বালক-বালিকাদের স্কুলের গল্পের বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সে বলে যে, বীর রাজা পুরুর মতো সে বিজয়ী আলেকজান্ডারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং সে দেখেছিল যে, আলেকজান্ডারেরা সব সময় পুরুদের সঙ্গে একই ব্যবহার করে; কারণ একমাত্র বীরই চিনতে পারে বীরের লক্ষণ সকল।[৩৩]

ঐতিহাসিক তথ্যানুসারে পুরুর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে আলেকজান্ডার তাকে কেবল ক্ষমা করে দিয়েছিল তা নয়, বরং নিজের অধিকৃত কিছু অঞ্চলসহ পুরুকে তার শাসন-ক্ষমতাও ফিরিয়ে দিয়েছিল। আজিজ পাঠানকে আলেকজান্ডার ও নিজেকে পুরুর সাথে তুলনা করে বদরুদ্দিন মহল্লায় তার ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্তির ঘোষণা দিয়েছে।

যে বদরুদ্দিন ১৯৭৩ সালে মহল্লায় প্রত্যাবর্তন করে রাস্তা দিয়ে ছায়ার মতো হেঁটে এসেছিল, ১৯৮০ সালের মধ্যে সে একজন বড় রাজনৈতিক নেতায় পরিণত হয়। মহল্লাবাসী তাকে তার দলের প্রধানকে সংবর্ধনা দিতে দেখে, নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে তার বক্তৃতা শোনে। এ-বক্তৃতায় সে যুদ্ধে তার নিজের ভূমিকাকে এক মহৎ-কীর্তি হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করে। ভিক্টোরিয়া পার্কের জনসভায় সে তার সহচর রাজাকার আবদুল গণিকে 'শহিদ' বলে ঘোষণা করে : 'বদু মওলানা অঙ্গুলিনির্দেশ করে শ্রোতাদের সেই বেঞ্চটি দেখিয়ে দেয় এবং বলে যে, যারা তখন ওই বেঞ্চের ওপর বসেছিল তারা জানে না, ওই বেঞ্চের ওপর আবদুল গণি শহীদ হয়েছিল'।[৩৪] পলাতক থাকাকালে পুত্র আবুল বাশারের পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঘটনাকেও বদরুদ্দিন একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। নিজেকে এই জনগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে পুত্রের মৃত্যুর ঘটনাকে ইসলাম ধর্মের এক কিংবদন্তির সাথে তুলনা করে সে :

> এখন মহল্লার লোকদের মনে পড়ে সেদিন বক্তৃতার সময় বদু মওলানা আকাশের দিকে দুহাত উঁচু করে ধরে বলেছিল যে, সেটা ছিল এক পরীক্ষা। আল্লাহ যেমন হযরত ইব্রাহীমকে প্রিয় পুত্র কোরবানি করতে বলে পরীক্ষা করেছিলেন, তেমনি তারও জীবনে পরীক্ষা আসে এবং সে তখন তার প্রিয়তম পুত্রকে হারায়।[৩৫]

বদরুদ্দিন এখন মহল্লাবাসীকে 'হারামযাদা', 'মাগি', 'মুনাফেক' বা 'মূর্তিপূজক কাফের' বলার পরিবর্তে 'ভাইসব' বলে সম্বোধন করে। অন্য সকল রাজনৈতিক দলের সাথে সম্মিলিতভাবে সরকার-বিরোধী হরতাল পালন করে এবং হরতালে অংশগ্রহণের জন্য তার ছেলে আবুল খায়ের জনগণকে ধন্যবাদ জানায় । এভাবে একাত্তরের যুদ্ধে পরাজিত বদরুদ্দিন এক দশক যেতে না যেতেই পুনরায় মহল্লার ক্ষমতা-কাঠামোতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে; তবে এ-সময়ে প্রভুত্বের পরিবর্তে মহল্লাবাসীর সম্মতির ভিত্তিতে আধিপত্যবাদী হয়ে উঠতেই সে অধিক সচেষ্ট হয়েছে।

বদরুদ্দিনের ক্ষমতার স্বরূপ

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধকালীন প্রভুত্ববাদী ক্ষমতার পরিবর্তে স্বাধীন বাংলাদেশে বদরুদ্দিন জনসমর্থন লাভের মাধ্যমে আধিপত্যবাদী হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছে। শুরু থেকেই মহল্লাবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর নিজের মতাদর্শকে চাপিয়ে দেওয়ার অভিসন্ধি তার কর্মকাণ্ডে লক্ষ করা যায়। কিন্তু যুদ্ধপূর্ব, যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে কখনোই সে তার ক্ষমতার পক্ষে মহল্লাবাসী জনতার মতাদর্শগত সম্মতি আদায় করতে সক্ষম হয়নি। আধিপত্য অর্জনের জন্য যে স্বেচ্ছামূলক আত্মসমর্পণ প্রয়োজন, গ্রামসি যাকে বলেছেন: 'spontaneous consent given by that great masses of the population to the general; direction imposed on social life by the dominant fundamental group'.[৩৬] মহল্লাবাসীর কাছ থেকে তা বদরুদ্দিন কখনোই আদায় করতে পারেনি। তার প্রভুত্ববাদী ক্ষমতার প্রতাপে মহল্লাবাসী বাধ্য হয়েছে তার ক্ষমতা-চর্চাকে

মেনে নিতে; কিন্তু বদরুদ্দিনের মতাদর্শের সাথে মানসিক একাত্মতা তারা কখনোই বোধ করেনি। কেউ প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ করেছে, কেউ নীরব থেকে মনে মনে ঘৃণা ও ক্রোধ পোষণ করেছে, আবার কেউ মহল্লা থেকে অন্তর্ধান করে মুক্তির সন্ধান করেছে।

চেতনাগত দিক থেকে যে রাজনৈতিক মতাদর্শ বদরুদ্দিন লালন করে মহল্লাবাসী কখনোই তা গ্রহণ করেনি। সাম্প্রদায়িক ভেদজ্ঞান ছিল তার মতাদর্শের মূল চালিকাশক্তি। কিন্তু মহল্লাবাসী আবহমান কাল ধরে তাদের আচরিত অসাম্প্রদায়িক জীবনচর্যায়ই স্থিত থেকেছে পূর্বাপর। মোমেনার বাসন্তী গোমেজের সাথে সদ্ভাবের কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। আবদুল মজিদের কৈশোরিক স্মৃতির একটি খণ্ডাংশ নিম্নরূপ :

> সে সময়, সে [আবদুল মজিদ] যখন হাফপ্যান্ট পড়ত, তখন শনিবার সন্ধ্যেয় সে দু'বাড়ির মাঝখানের দেয়ালের ওপর চড়ে বসে থাকত। তখন মায়ারাণীর মা আসত মাথায় ঘোমটা টেনে, কপালে থাকত পূর্ণিমার চাঁদের মতো বড় এবং গোল সিঁদুরের টিপ। মায়ারাণীর মা কাঁসার থালার ওপর সরষের তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে ফটকের কাছে তুলসী গাছের কাছে এসে বসত এবং একইভাবে শনিকে ডাকত। তুলসী গাছের গোড়ায় বাঁধানো নিচু বেদির ওপর রাখা প্রদীপ জ্বলত, আবদুল মজিদ শুনত মায়ারাণীর মার শনি-আবাহন– আসেন শনি বসেন খাটে, পস্‌সাদ দেব হাতে হাতে। এভাবে পুজো হয়ে গেলে, মায়ারাণী হাতে করে একটি বড় বাটি নিয়ে আসত এবং প্রাঙ্গণে অপেক্ষমান বালক-বালিকা ও দেয়ালের ওপর বসে থাকা আবদুল মজিদের প্রসারিত করতলের ওপর কলা ও দুধ মাখানো ভিজে চিড়ার একটি করে মণ্ড অর্পণ করত।[৩৭]

মজিদের মানসপটে মায়ারাণী মালাকারের মা, তার শনি-পূজা ও মায়ারাণীর হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষ শিশুদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের যে চিত্র অঙ্কিত, তা মহল্লার হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দিকটিকে প্রকাশ করে। এ-সম্প্রীতি পনের বছর পরও অটুট ছিল। তাই ১৯৮৫ সালে যেদিন আবদুল মজিদের স্ত্রী ইয়াসমিন একটি কন্যাসন্তান প্রসব করে, সেদিন বিকেলেই মায়ারাণী নবজাতক শিশুকন্যাটিকে দেখতে আসে এবং ইয়াসমিনের শয্যাপাশেই তার বসার আসন হয়।

'অপর'কে নিকৃষ্ট প্রমাণ করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন, আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এক সাম্রাজ্যবাদী কৌশল। নৃবিজ্ঞানের মতো প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান-শাখা সৃষ্টি করে জাতি, বর্ণ, চুলের প্রকৃতি, কপালের আকৃতি, নাকের গড়ন, এমনকি লিঙ্গের আকৃতির ভিত্তিতে মানুষকে বিভাজিত করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছিল পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো। প্রতিপক্ষকে হীন প্রতিপন্ন করার এই সাম্রাজ্যবাদী কৌশল বদরুদ্দিন প্রয়োগ করেছে খাজা আহমেদ আলীর ওপর। মৃত্যুর পরেও আহমেদ আলীর প্রতি মহল্লাবাসীর শ্রদ্ধাবোধ অটুট থাকলে বদরুদ্দিন প্রচার করার চেষ্টা করে যে, আজান অসমাপ্ত রেখেই আহমেদ আলী নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও আহমেদ আলীর সুমধুর কণ্ঠস্বর ও আজান শেষে চার বার 'আল্লাহু আকবর' বলতে শোনা সম্পর্কিত মহল্লাবাসীর বিশ্বাস অনড় থাকলে, বদরুদ্দিন তাকে 'মুনাফেক' বলে ঘোষণা করে এবং মহল্লাবাসীকে 'মূর্তিপূজক কাফের' বলে গাল দেয়। তবুও মহল্লাবাসী তার কথা গ্রহণ না করলে আহমেদ আলীর প্রতি তাদের সম্মানবোধকে নস্যাৎ করতে বদরুদ্দিন তার গৃহপালিত কুকুর ভুলুর মৃতদেহ এনে আহমেদ আলী ও তার পুত্রের কবরের পাশে কবর দেয় : 'বদু মওলানার লোকেরা ধপাধপ করে মাটি খুঁড়ে খাজা

আহমেদ আলীর বাড়ির উঠানে, তার আর তার ছেলের কবরের পাশে কুকুরের মৃতদেহটি কবর দেয় এবং তারপর মহল্লার আতঙ্কিত লোকদের দিকে তাকিয়ে সে বলে, এই কবরে কোনো পীর নাই, কুত্তা আছে।'[৩৮]

আহমেদ আলীর প্রতি মহল্লাবাসীর সম্মানবোধের ওপর ঘৃণিত এক কুকুরের লাশ চাপিয়ে দিয়ে মহল্লায় নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উক্ত চেষ্টাও ব্যর্থ হয় বদরুদ্দিনের। যুদ্ধ-শেষে বিক্ষুব্ধ জনতা বদরুদ্দিনের রাজাকার বাহিনীর সদস্য আবদুল গণিকে হত্যা করলে, লক্ষ্মীবাজারের লোকেরা আহমেদ আলী ও তার পুত্রের কবরের পাশ থেকে কুকুরের হাড়গুলো তুলে আবদুল গণির দ্বিখণ্ডিত দেহের সাথে একত্র করে বুড়িগঙ্গার পানিতে ফেলে দেয়। খাজা পরিবারের শহিদদ্বয়ের প্রতি এ-জনগোষ্ঠীর সম্মানবোধ তখনো কতটা প্রবল ছিল তা তাদের কবর খোঁড়ার সময়ের সশ্রদ্ধ সতর্কতা দৃষ্টে স্পষ্ট হয় :

> তারা মহল্লায় খাজা আহমেদ আলী আর খাজা শফিকের কবরের কাছে ছুটে যায়, অতি সন্তর্পণে কুকুরের প্রোথিত কঙ্কালের সঠিক স্থান নির্ধারণ করে এবং খুব আস্তে ও যত্নের সঙ্গে বদু মওলানার পরিবারের মৃত কুকুরের চাপা দেওয়া দেহাবশেষের ওপর থেকে মাটি সরায়। তারা কুকুরের হাড়গুলো এমনভাবে মাটি থেকে আলাদা করে, যেন মাটি এবং সেই মাটিতে শায়িত খাজা আহমেদ আলী এবং খাজা শফিক টের না পায়, তারা কি করে।[৩৯]

যুদ্ধ-চলাকালেও বদরুদ্দিন মহল্লাবাসীকে সালাম দিয়েছে, নরম করে হেসেছে। কিন্তু তার সেই শান্তির বাণী আর নম্রহাস্যের অন্তরালবর্তী আধিপত্যবাদী চরিত্র, মহল্লাবাসীর সম্মানের পাত্র হয়ে ওঠেনি কখনোই। অবশ্য প্রভুত্বের দাপটে বদরুদ্দিনও তাতে খুব বেশি শঙ্কিত হয়নি। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে তার প্রভু-শক্তির মূল উৎসের অন্তর্ধানে বদরুদ্দিন মহল্লাবাসীর সমর্থন আদায়ে পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু তাতেও খুব বেশি সুবিধা করতে পারেনি সে। মহল্লায় প্রত্যাবর্তন করে যুদ্ধে স্বজনহারা পরিবারগুলোর খোঁজ নিতে গেলে তারা সকলেই তার এই কৃত্রিম সমবেদনা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে ও তাকে স্ব স্ব বাড়ি থেকে বিতাড়িত করেছে। তার 'কেমন আছেন আপনেরা?' কুশল প্রশ্নের উত্তরে আবদুল মজিদের মা বলেছে 'থুক দেই, থুক দেই, থুক দেই মুখে'; আহমেদ আলীর স্ত্রী জয়নব বেগম 'খবরদার, খবরদার!' হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে তাদের প্রাঙ্গণে বদরুদ্দিনের প্রবেশ আটকেছে; আবু করিমের স্ত্রী মূর্ছিত হয়ে পড়েছে। আলাউদ্দিনের মা রীতিমতো রণচণ্ডী-বেশ ধারণ করেছে। প্রথমে সে বদরুদ্দিনের মুখের ওপর বাসনকোসন ছুড়ে মেরেছে, তারপর চুলার ফুঁকনি নিয়ে তাকে তাড়া করেছে এবং বদরুদ্দিন আছাড় খেলে তাকে লক্ষ করে ফুঁকনি ছুড়ে মেরেছে। কেবল নিহতদের পরিবারই নয়, বদরুদ্দিনের প্রত্যাবর্তনে মহল্লাবাসী প্রত্যেকেই এক প্রবল অস্বস্তি অনুভব করেছিল সেদিন :

> সে রাতে লক্ষ্মীবাজারের লোকদের ঘুম আসে নাই বলে পরদিন সকালে তারা একে অন্যকে বলেছিল। তারা বলেছিল যে, সে দিন রাতে তাদের স্ত্রীরা স্খলিত শয্যায় শোকার্ত রমণীর মতো পড়ে ছিল এবং তারা অস্থিরতার এক প্রবল প্রবাহে উড্ডীন হয়েছিল।[৪০]

পনের বছর পর, বদরুদ্দিন যখন বড় রাজনৈতিক নেতা, তখনও তার প্রতি এই জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি অপরিবর্তিতই থেকে যায়। তাই বদরুদ্দিনের ছেলে আবুল খায়ের মহল্লাবাসীকে 'ভাইসব'

সম্বোধন করলে আবদুল মজিদের হৃদয়ের তন্তু ছিন্ন হয় : 'আবদুল মজিদের মনে হয়, তার হৃদয়টি বহুদিন থেকেই বিদীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু এই দিন, উইপোকার হত্যাযজ্ঞের বিষণ্ন বিকেলে আবুল খায়েরের কথা শুনে তার হৃদয়ের তন্তু তার স্যান্ডেলের ফিতার মতো পুনরায় ছিন্ন হয়।'[৪১] একাত্তর সালে বদরুদ্দিনের প্রতি যে প্রবল অবিশ্বাস ও ঘৃণা জন্ম নিয়েছিল মহল্লাবাসীর মনে তা আর কখনোই খণ্ডানো সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। মহল্লাবাসীর হৃদয়গত এই বোধের কথা বদরুদ্দিন যেমন ভোলেনি, তেমনি তার ভূতপূর্ব প্রভুত্ববাদী ক্ষমতার প্রলয়ংকর রূপও মহল্লাবাসী বিস্মৃত হয়নি :

> একাত্তর সনের স্মৃতি সবচাইতে বেশি মনে রয়ে গেছে বদু মওলানার। বদু মওলানা এই বিষয়টি ভোলে নাই যে, মোমেনাকে রাজাকাররা ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছিল এবং সম্ভবত দেশ মুক্ত হওয়ার পর মহল্লায় ফিরে আলাউদ্দিনের মায়ের তাড়া খাওয়ার পর বুঝতে পারে যে, এই জনগোষ্ঠীও কোনো কিছুই ভুলে যায় নাই।[৪২]

অর্থাৎ, যুদ্ধের নয় মাস ও যুদ্ধোত্তরকালে বদরুদ্দিন ক্ষমতাবান হয়ে উঠলেও তার সেই ক্ষমতা কেবল প্রভুত্বের ভিত্তির ওপরেই টিকে ছিল। মহল্লাবাসীর চিন্তাজগতের নেতৃত্ব বা বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রের আধিপত্য সে কখনোই লাভ করতে সক্ষম হয়নি। তাই এ-সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, বদরুদ্দিনের ক্ষমতার স্বরূপ হলো আধিপত্যহীন প্রভুত্ব।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী প্রেক্ষণে উপন্যাসটি পাঠের সীমাবদ্ধতা

প্রবন্ধের উপর্যুক্ত অংশে *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* উপন্যাসে বর্ণিত মহল্লাটির সামাজিক ক্ষমতা-কাঠামোতে বিদ্যমান ক্ষমতা-সম্পর্কসমূহ বিশ্লেষণ করে এর ক্ষমতাকেন্দ্রে সমাসীন বদরুদ্দিনের ক্ষমতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী আলোকপ্রক্ষেপে। কিন্তু উপন্যাসটিতে অর্থনৈতিক শ্রেণি-সম্পর্কের অনুপস্থিতির সীমাবদ্ধতাজনিত কারণে সব বিচার-বিশ্লেষণ ও তার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের একটি সীমাবদ্ধতা রয়েই যায়। তাই এ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আলোয় আলোচ্য উপন্যাসে বর্ণিত সমাজের ক্ষমতা-কাঠামোটির আগাপাশতলা দেখতে গেলে, এর 'আগা' ও 'পাশ' যতটা স্পষ্টভাবে পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়, এর 'তলা' যেন ততটাই অনালোকিত অবস্থায় অগোচরে থেকে যায়। মার্কসীয় তত্ত্বমতে, একটি সমাজের 'তলা' বা ভিত্তিকাঠামো হলো তার উৎপাদনব্যবস্থা : 'উৎপাদনব্যবস্থা হচ্ছে সকল কিছুর নিয়ামক – এটাই সমাজের ভিত্তি বা ভেতরকাঠামো, যার উপর দাঁড়িয়ে থাকে সমাজের শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্ম, দর্শন, রাষ্ট্র, আইন ইত্যাদি সম্বলিত উপরিকাঠামোটি।'[৪৩] রক্ষণশীল ধ্রুপদী মার্কসবাদীদের ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর মধ্যকার এক-বনাম-এক যান্ত্রিক সম্পর্ক নয়া মার্কসবাদীগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হলেও, কোনো মার্কসবাদীই সমাজ বিশ্লেষণে এর অর্থনৈতিক ভিত্তিকে অস্বীকার করতে পারেননি। অর্থাৎ, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী প্রেক্ষণে কোনো সমাজকে অবলোকন করতে গেলে ঐ সমাজের উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের সমবায়ে সৃষ্ট উৎপাদনব্যবস্থাকে আমলে আনতেই হয়। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসটিতে মহল্লার সমাজের উপরিকাঠামোর নানা উপাদান, সংস্কৃতি-শিক্ষা-ধর্ম-রাজনীতি, সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেলেও এর উৎপাদনব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না; যা উক্ত মহল্লাটির ক্ষমতা-কাঠামোর পূর্ণাবয়ব অবলোকনের পথে একটি প্রধান অন্তরায়।

মহল্লাটির সামাজিক ক্ষমতা-কাঠামোর কেন্দ্রে সমাসীন বদরুদ্দিনের বা তার বিপরীত যুগ্মতায় উপস্থিত মহল্লাবাসীর কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের হদিস উপন্যাসে নেই। ফলে অর্থনৈতিক ক্ষমতা-সম্পর্কের নিরিখে বদরুদ্দিন ও মহল্লাবাসী অপরাপর চরিত্রসমূহের কার অবস্থান কোথায় সে সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা উপন্যাস পাঠে পাওয়া যায় না। এমনকি, মোটর গ্যারেজকর্মী আলাউদ্দিন ও হাজাম ইসমাইল ব্যতীত মহল্লার ক্ষমতা-সম্পর্কে যারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে – বদরুদ্দিন, আবদুল মজিদ, খাজা আহমেদ আলী, খাজা শফিক, আবু করিমের বড় ছেলে, জমির ব্যাপারী – তাদের কারো পেশাগত পরিচয়টুকুও ঔপন্যাসিক উল্লেখ করেননি। মহল্লার অর্থনৈতিক ভিত্তিকাঠামোটি উপেক্ষিতই রয়ে গেছে উপন্যাসটিতে।

সমগ্র উপন্যাস জুড়ে বদরুদ্দিনকে দেখা যায় ধর্ম ও রাজনীতি এই দুয়ের ওপর ভর করে ক্ষমতা অর্জন ও চর্চায় রত। কিন্তু ধর্ম ও রাজনীতি উভয়ই সমাজের উপরিকাঠামোর উপাদান। ভিত্তিকাঠামো তথা উৎপাদনব্যবস্থায় কর্তৃত্ব অর্জনের পর উপরিকাঠামোর উপাদানসমূহে প্রভাব বিস্তার করে সেই ক্ষমতাকে আরও সুদৃঢ় করা সম্ভব। কিন্তু ভিত্তিকাঠামোকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কেবল উপরিকাঠামোয় প্রভাব বিস্তার করে সমাজে ক্ষমতাবান হয়ে ওঠা মার্কসীয় তত্ত্বসম্মত নয়।

যুদ্ধ-চলাকালে মিলিটারির সাথে যোগসাজশে বদরুদ্দিন প্রভুত্ববাদী ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল, তা উপন্যাসে স্পষ্ট। কিন্তু যুদ্ধোত্তর সময়ে তার ক্ষমতার উৎস ও স্বরূপ অনুধাবনের জন্য পর্যাপ্ত সমাজতাত্ত্বিক উপাদান উপন্যাসটিতে অনুপস্থিত। এ-কালপর্বে তার প্রভুত্ববাদী ক্ষমতার মূল উৎস অন্তর্হিত এবং সম্মতিমূলক আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েও সে ব্যর্থ। তাহলে কোন শক্তিবলে সে পুনরায় মহল্লায় ক্ষমতাসীন হয়ে উঠল? এ-প্রশ্নের কোনো বাস্তবসম্মত উত্তর উপন্যাসে নেই। ভিত্তিকাঠামোতে কর্তৃত্ব অর্জন ব্যতীত, কেবল ধর্ম বা রাজনীতির মতো সমাজের উপরিকাঠামোর এক বা একাধিক উপাদান কি তার সামাজিক ক্ষমতাকেন্দ্রে সমাসীন হওয়ার জন্য যথেষ্ট? মার্কসীয় তত্ত্বমতে, না। হয়ত সে মহল্লার অর্থনৈতিক ভিত্তিকাঠামোতেও কর্তৃত্ববান হয়ে উঠেছিল; কিন্তু উপন্যাসের টেক্সটে সে-বিষয়ক কোনো তথ্যের সন্ধান মেলে না। এই সীমাবদ্ধতার ফলে মহল্লার সামাজিক ক্ষমতা-কাঠামোতে বদরুদ্দিনের অবস্থান ও তার ক্ষমতার স্বরূপ নির্ণয়, সর্বোপরি উক্ত মহল্লা-বিষয়ক যেকোনো ধরনের বস্তুবাদী সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত একদেশদর্শী হতে বাধ্য।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ হাসান আজিজুল হক, 'সোনা-মোড়া কথাশিল্প: শহীদুল জহির', *শালুক*, বর্ষ নয়, সংখ্যা ১০, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃ. ১২

২ আহমাদ মাযহার, 'শহীদুল জহিরের *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা*: মুক্তিযুদ্ধ-ভিত্তিক ব্যত্যয়ী সৃষ্টি', *আধুনিকতা: পক্ষ, বিপক্ষ*, ঢাকা, অনন্যা, ২০০১, পৃ. ৬২

৩ হাসান আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৪ নিপা জাহান, '*জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা*: ইতিহাসের বিকল্প বয়ান', *প্রাচ্যবিদ্যা পত্রিকা*, নবম সংখ্যা, জুন ২০১৯, পৃ. ১৮৩

৫ Karl Marx and Frederick Engels, *Menifesto of the Communist Party*, Charles H. Kerr & Company, Chicago, 1906

৬ Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks* (edited and translated by Quintin Hoare & Geoffrey Nowell Smith), New York, International Publishers, 1992

৭ Ibid, pp. 57-58

৮ 'আধিপত্য' শব্দটি 'কর্তৃত্ব', 'প্রভুত্ব', 'রাজত্ব' প্রভৃতি শব্দের সমার্থক হিসেবেও বহুল প্রচলিত। তবে বর্তমান প্রবন্ধে, তুলনামূলক অধিক উপযোগী শব্দের অভাবে, 'আধিপত্য' শব্দটি কেবল 'সম্মতিমূলক কর্তৃত্ব' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৯ Karl Marx & Friedrich Engels, *On Religion*, Moscow, Progress Publishers, 1981, p. 46

১০ খোন্দকার আশরাফ হেসেন, 'মার্কসীয় নন্দন ও সাহিত্যতত্ত্ব', *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব* (সম্পা. বেগম আকতার কামাল), ঢাকা, অবসর, ২০১৪, পৃ. ৮৮

১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

১৩ ফাহিমুল কাদির, 'হেজিমনি : গ্রামসীয় ব্যাখ্যা', *আন্তোনিও গ্রামসি: জীবনসংগ্রাম ও তত্ত্ব* (সম্পা. খন্দকার সাখাওয়াত আলী), ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ২০১১, পৃ. ২৯২

১৪. অজিত রায়, *আন্তোনিও গ্রামসি : জীবন ও তত্ত্ব* (সম্পা. সৌরীন ভট্টাচার্য, শোভনলাল দত্তগুপ্ত), কলকাতা, সেরিবান, ২০২৩, পৃ. ৭৮

১৫ দ্রষ্টব্য, অজিত রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

১৬ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, 'ক্ষমতা প্রসঙ্গে দুই প্রেক্ষিত : গ্রামশি ও মিশেল ফুকো', *মিশেল ফুকো : পাঠ ও বিবেচনা* (সম্পা. পারভেজ হোসেন), ঢাকা, সংবেদ, ২০০৭, পৃ. ১৭৩

১৭ মুক্তিযুদ্ধ-চলাকালে মোমেনার বয়স ছিল কুড়ি। এই ঘটনার সংঘটনকালে মোমেনা কলেজিয়েট স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী ছিল।

১৮ শহীদুল জহির, 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা', *শহীদুল জহির উপন্যাসসমগ্র* (সম্পা. মোহাম্মদ আবদুর রশীদ), ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, ২০১৯, পৃ. ১৮

১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯

২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

২৫ 'Male and female are created through the erotization of dominance and submission. The man/woman difference and the dominance/submission dynamic define each other. This is the social meaning of sex and the distinctively feminist account of gender inequality'. (Catharine MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State*, Harvard University Press, 1989, p. 128.)

২৬ এ-বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে শিবলিঙ্গের ধারণাটি বৈদিক যূপস্তম্ভ থেকে এসেছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কোনো কোনো শাস্ত্রগ্রন্থে শিবলিঙ্গকে ঈশ্বরের বিমূর্ত প্রতীক বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যার সাথে পুরুষাঙ্গের কোনো যোগসূত্র নেই।

২৭ Sigmund Freud, 'The Infantile Genital Organization of the Libido : A Supplement to the Theory of Sexuality', *Int. J. Psycho-Analaisis*-5 [Tr. Joan Riviere], 1924, p. 128

২৮ শহীদুল জহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
৩০ প্রাগুক্ত
৩১ শহীদুল জহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
৩২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
৩৬ Antonio Gramsci, 'Hegemony', *Literary Theory : An Anthology* (eds. Julie Rivkin & Michael Yyan), Malden, MA and Oxford: Blackwell, 1998, p. 277
৩৭ শহীদুল জহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪
৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৪৬
৪০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
৪১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
৪২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
৪৩ খোন্দকার আশরাফ হেসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪-৭৫